আলো পথ
আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১৪, পঞ্চম সংখ্যা
এমএলই নিউজলেটার

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস ২০১৪

আদিবাসী অধিকার প্রতিষ্ঠায় মুক্তিকামী জনতার সেতুবন্ধন

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস ২০১৪-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

৯ আগস্ট আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস। পৃথিবীর ৯০টি দেশের ৪০ কোটি আদিবাসীর মতো বাংলাদেশের আদিবাসী জনগণও ৯ আগস্ট আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালন করে।

এবারের আদিবাসী দিবসের মূল প্রতিপাদ্য ছিল, **'আদিবাসী অধিকার প্রতিষ্ঠায় মুক্তিকামী জনতার সেতুবন্ধন'**। ১৯৯৩ সালকে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক আদিবাসী বর্ষ ঘোষণা করে। সাধারণ পরিষদ ১৯৯৪ সালে সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে ৯ আগস্ট আদিবাসী দিবস পালনের আহ্বান জানায়। এরপর জাতিসংঘ ১৯৯৫ থেকে ২০০৪ এবং ২০০৫ থেকে ২০১৪ দুটো দশককেই আদিবাসী দশক হিসেবে ঘোষণা করে। বরাবরের মতো এবারও পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা এ দিনে তাদের অধিকার আদায়ের জন্য শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের দাবি তুলে ধরে। এবারের আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসে সরকারের কাছে অধিকারবঞ্চিত আদিবাসীরা এটাকে প্রাণের দাবি হিসেবে পুনরায় উত্থাপন করে।

বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম দিবসটি উপলক্ষে পাঁচদিনের কর্মসূচি ঘোষণা করে। এসব কর্মসূচির মধ্যে ছিল: ৬ আগস্ট জাতীয় জাদুঘরের সামনে মানববন্ধন; ৮ আগস্ট বিকাল ৩টায় রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও ৯ আগস্ট বিশ্ব আদিবাসী দিবসে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সকাল ১০টায় সমাবেশ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও র‍্যালি। ১০ আগস্ট জাতীয় জাদুঘরের সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পর্যটন ও বেসরকারি বিমান চলাচল মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব রাশেদ খান মেনন। মন্ত্রী মহোদয় বলেন, নিরাপত্তার চশমা দিয়ে আদিবাসী সমস্যা দেখলে চলবে না। আদিবাসীদের বিচ্ছিন্ন করে নয়, তাদের সম্পৃক্ত করেই বাংলাদেশকে সামনের দিকে এগোতে হবে। তিনি বলেন, পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করে প্রশংসিত হয়েছিল আওয়ামী লীগ। কিন্তু এখনও চুক্তির অনেক কিছুই বাস্তবায়িত হয়নি। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার বর্তমান মেয়াদের মধ্যেই চুক্তিটি বাস্তবায়ন করবে এবং একই সঙ্গে সমতলের আদিবাসীদের জন্য স্বতন্ত্র ভূমি কমিশন গঠন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ক্ষোভের প্রকাশ ঘটলেও উৎসবমুখর পরিবেশে দেশের বিভিন্ন জায়গায় পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস। এবারের বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীকে সরকারের আদিবাসী হিসাবে অস্বীকৃতির ক্ষোভ ও প্রতিবাদ এবং সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবি জানাতে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসে এসব জাতিগোষ্ঠী রাজপথে নামলেও দিবস পালনের আনন্দে সমাবেশ ও শোভাযাত্রা উৎসবে পরিণত হয়। এ সময় বিভিন্ন দাবি সম্বলিত শ্লোগানসহ স্ব স্ব সংস্কৃতির নাচ-গানের তালে তালে মুখর হয়ে ওঠে আদিবাসী অধ্যুষিত রাজপথ। হাজার হাজার নারী-পুরুষের পদভারে জনতার ঢল পরিণত হয় জনস্রোতে। অনেক বাঙালি নারী-পুরুষ এই কর্মসূচিতে যোগ দেন।

ছবি ও সংবাদ সূত্র : ইন্টারনেট

একটি পাহাড়ি গ্রামের গল্প

কাপ্তাই থেকে ইউএনডিপি'র জলযান স্পিডবোটে চড়ে আমরা রওয়ানা হলাম লতাপাহাড়ের উদ্দেশ্যে। লতাপাহাড় বিলাইছড়ি উপজেলার একটি জনপদ যেখানে পাঙ্খুয়া ও মারমা সম্প্রদায়ের লোকেরাই বাস করেন। কর্ণফুলি নদীর মোহনা পেরিয়ে আমরা প্রবেশ করি রেইনখং নদীতে। রেইনখং কিছুদূর পর্যন্ত গভীর ও প্রশস্ত হলেও বিলাইছড়ি থেকে এটি ক্রমশ সরু ও খালের মতো হয়ে গিয়েছে। বিলাইছড়িতে আমাদের সঙ্গী হন রেমেলিয়ান। রেমেলিয়ান পাঙ্খুয়া সম্প্রদায়ের উচ্চ শিক্ষিত যুবক। স্ত্রী অনার্স পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন মিজোরামে। বসবাস করেন রাঙামাটি শহরে। ইউএনডিপি'র হয়ে রেম কাজ করেন বিলাইছড়িতে। পদবিতে তিনি প্রকল্পের উপজেলা শিক্ষা অফিসার। রেমকে নিয়ে পাঙ্খুয়া পাড়া অবধি যাওয়ার পর কম গভীরতার কারণে স্পিডবোট আর যাচ্ছিল না। আমরা যাত্রা শুরু করি একটি দেশী ইঞ্জিন নৌকায়। নৌকার চালক রবার্ট হয়ে ওঠে আমাদের সমগ্র যাত্রার কাণ্ডারি। তিন ঘন্টায় আমরা পৌঁছলাম অড়াইছড়ি বাজারে। সেখান থেকে টিলা আর খাল পেরিয়ে পৌঁছি জামুইছড়ি গ্রামে। এখানে ইউএনডিপি পরিচালিত পার্বত্য জেলা প্রকল্পের একটা বেসরকারি প্রাইমারি স্কুল আছে। এখানে বয়স্ক সাক্ষরতার একটা দলও গড়ে উঠেছে। কাজেই এখানে গ্রামের লোকের সঙ্গে কথা বলতে হবে। লতাপাহাড়ে উঠতে আমার লাগবে কমপক্ষে তিন ঘন্টা, আর অন্যরা তার অর্ধেক সময়ে যেতে পারবেন। আমাদের সঙ্গে ছিলেন চট্টগ্রাম পার্বত্য জেলাসমূহে ইউএনডিপি'র শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী প্রকল্প সিএইচটিডিএফ'র কর্মকর্তা সুখেশ্বর চাকমা, যিনি সবার কাছে পল্টুদা নামে পরিচিত। (আমার পাহাড়ে উঠার পারদর্শিতা দেখে পল্টুদা এ মত পোষণ করেছিলেন)। যা-ই হোক আমি জামুইছড়িতে থেকে যাই , অন্যরা চলে যান লতাপাহাড়ে। জামুইছড়িতে বয়স্ক শিক্ষায় অংশগ্রহণকারী ১৪ জন নারী-পুরুষের সঙ্গে ঘন্টা দুয়েক আলোচনা করি সাক্ষরতায় তাদের আগ্রহ এবং তাদের জীবন-যাপন বিষয়ে। তাদের জীবন জীবিকা নিয়ে এখানে কিছু বলা যায়।

জামুইছড়িতে ৬০টি পরিবারের বসবাস। শান্তি চুক্তির আগে ৭/৮টি পরিবার থেকে ক্রমান্বয়ে পরিবারের সংখ্যা বেড়েছে। অর্ধেক তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায়ের, বাকিরা মার্মা। সবাই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। গ্রামের কারবারির নাম প্রদীপ তঞ্চঙ্গ্যা। তিনিও বয়স্ক শিক্ষাদলের শিক্ষার্থী ছিলেন। জুম চাষ আর কলার বাগানই মূলত তাদের পেশা। ২০০৫-৬ সাল থেকে এখানে সেগুন বাগান ধ্বংসের মহোৎসব চলেছে। বাংলাদেশের নানা স্থান থেকে ব্যবসায়ীরা এসে এগুলো কিনেছে। এগুলোর কতটা বনবিভাগ আইনসম্মতভাবে করেছে আর কতটা বেআইনিভাবে নিধন হয়েছে সে খবর এ গ্রামের মানুষ রাখেন না। তবে বলেছেন, ঐ সময় তাদেরও নগদ টাকা প্রচুর রোজগার হয়েছে, কিন্তু তারা সে টাকা ধরে রাখতে পারেননি। এজন্য লেখাপড়া না জানাকেই তারা দায়ী করেন। গ্রামের একমাত্র এসএসসি পাশ ছেলে মিয়ানমার হয়ে মালয়েশিয়া পাড়ি জমিয়েছে। কারবারি গ্রামের একমাত্র পাওয়ার টিলারের মালিক। এটি দিয়ে বনবিভাগের মালিকানাধীন দখলে থাকা কৃষি জমি তারা চাষ করেন। এ দখল নিয়েই জমি কেনাবেচাও চলে। এলাকার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি গ্রাম থেকে দুই ঘন্টা হাঁটাপথ দূরত্বে। আর তাই এখানে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ইউএনডিপি এর প্রকল্প থেকে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে ২০০৯ সালে। শিশু শ্রেণি থেকে শুরু করা এ স্কুলে বর্তমানে ১০৩ জন শিক্ষার্থী। শিক্ষক ৩ জন। এবার ১৪ জন শিক্ষার্থী সমাপনী পরীক্ষা দেবে। গ্রামের মানুষ ৪০ শতক জমির ভিটা উঁচু করেছেন। গাছ লাগিয়েছেন। স্কুলঘর বানাতে শ্রম দিয়েছেন। ইউএনডিপি প্রকল্পের মেয়াদ ক্রমে শেষ হয়ে আসছে। গ্রামবাসী একান্তভাবে আশা করেন, স্কুলটি সরকারিকরণ হবে। সরকারি ঘোষণার কারণে রমজান মাসে স্কুল বন্ধ। কিন্তু চতুর্থ শ্রেণি ও পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে ৪টা পর্যন্ত পড়ানো হয়েছে। প্রতিটি শিক্ষার্থী টিফিন কেরিয়ার হাতে করে এক কিলোমিটার দূর থেকেও এখানে পড়তে আসে। পাহাড়ের এক কিলোমিটার মানে অনেক পথ টিলায় ওঠে এবং ঢাল বেয়ে নামতে হয়। আধুনিক ধ্যান-ধারণায় এরা বড় হচ্ছে। এদের মা বাবা স্বপ্ন দেখেন এরা লেখাপড়া শিখে এলাকাকে ধনে ও যোগাযোগে উন্নত করে তুলবে। শিশুর শিক্ষা প্রদানের সাংবিধানিক দায়িত্ব যদি সরকার পালন করে, তবে এরকম আশা পূরণ দুঃসাধ্য নয়। সেইরাতে আমাকে স্কুল ঘরের বেঞ্চ একত্র করে রাতে থাকতে দেওয়া হয়েছে। দরজা জানালা খুলে একেবারে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমানোর অভিজ্ঞতাও অনেক দিন মনে রাখার মতো।

আ.ন.স হাবীবুর রহমান

নৃ-জাতিগোষ্ঠী: চাকমা ভাষাচর্চা কোন পথে

পার্বত্য চট্টগ্রামে ১১টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার রয়েছে নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি। ভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে সংখ্যাগতভাবে এ দেশে বাংলা ভাষার পরে চাকমা ভাষার অবস্থান (২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, চাকমা জনগোষ্ঠী চার লাখ ৪৪ হাজার)। ভাষাগত দিক থেকে চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যাদের ভাষা অনেকটা কাছাকাছি। অনেক ভাষাবিদ তঞ্চঙ্গ্যা ভাষাকে চাকমা ভাষার উপভাষা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, একটু গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে এ দুটি ভাষার মধ্যে উচ্চারণগত ভিন্নতা ছাড়া তেমন কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। পার্বত্য চট্টগ্রামে ১১টি ভিন্ন ভাষাভাষী জাতির মধ্যে চাকমারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। চাকমাদের আবাসস্থল পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়াও ভারতের মিজোরাম, অরুণাচল, ত্রিপুরা, আসাম ও মিয়ানমারে রয়েছে। সমগ্র পৃথিবীতে প্রায় ছয় লাখ লোক চাকমা ভাষায় কথা বলে। মূলত চাকমা ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় বৃহৎ ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত জাতিগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে চাকমা ও মারমাদের ছাড়া আর কোনো গোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষার বর্ণমালা নেই।

চাকমা ভাষার লেখনরীতি 'মন খমে'র অনুরূপ। চাকমাদের নিজস্ব বর্ণমালা আছে, তবে এর সংখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যেমন, ড. জি এ গ্রিয়ারসন তাঁর 'লিঙ্গুয়েস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া' গবেষণায় (১৯০৩) চাকমা ভাষায় ৩৩টি বর্ণমালার কথা উল্লেখ করেছেন। সতীশ চন্দ্র ঘোষ তাঁর *চাকমা জাতি* (১৯০৯) গ্রন্থে ৩৭টি বর্ণমালার কথা বলেছেন। অন্যদিকে, নোয়ারাম চাকমা ১৯৫৯ সালে তাঁর চাকমা বর্ণমালার *পত্তম শিক্ষা* নামক শিশুপাঠ্য বইয়ে ৩৯টি বর্ণমালার কথা উল্লেখ করেছেন। বর্তমানে চাকমা ভাষায় ৩৩টি বর্ণমালা ব্যবহৃত হচ্ছে।

চাকমারা একসময় তান্ত্রিক বৌদ্ধমতে বিশ্বাসী ছিলেন। এ মতের অনুসারী লুরি বা পুরোহিতেরা চাকমা বর্ণমালার সাহায্যে তাঁদের ধর্মগ্রন্থ আঘরতারা রচনা করেছিলেন। এই *আঘরতারা* গ্রন্থটি চাকমাদের সবচেয়ে প্রাচীন পুঁথি হিসেবে আজও বিবেচিত হয়ে থাকে। তা ছাড়া তান্ত্রিক শাস্ত্র বা চিকিৎসাশাস্ত্রে চাকমা বৈদ্যরা (পল্লী চিকিৎসক) চাকমা লিপি ব্যবহার করতেন, যেটি বংশ পরম্পরায় ও তাঁদের শিষ্যদের মাধ্যমে এর ব্যবহার আজও অব্যাহত রয়েছে।

আঠারো শতকের (১৭৭৭) দিকে চাকমা সাধক কবি শিবচরণ তাঁর *গোজেন লামা* গীতিকাব্যটি চাকমা বর্ণমালায় রচনা করেছিলেন। তাই ধারণা করা হয়, চাকমা সাহিত্য ও তান্ত্রিক শাস্ত্রচর্চায় চাকমা বর্ণমালা ব্যবহারের প্রচলন বহু আগে থেকে শুরু হয়েছে।

অন্যদিকে, ১৮৬০ সালে খ্রিষ্টান মিশনারিজদের উদ্যোগে এলাহাবাদ থেকে চাকমা বর্ণমালায় বাইবেলের অনুবাদ করা হয়। এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য ধর্ম প্রচার হলেও এর মধ্যে চাকমা বর্ণমালার সবিশেষ স্বীকৃতি ছিল, যেটি চাকমা বর্ণমালার ভিত্তিকে আরও মজবুত করেছে। এ ছাড়া ১৯৪০ সালের শুরুর দিকে রাঙামাটি হাইস্কুলের ইংরেজ শিক্ষক মি. মিলার চাকমা সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের বাংলা হরফে চাকমা ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষাদানের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এ উদ্যোগকে ধর্মান্তঃকরণের প্রচেষ্টা মনে করে সে সময়ের চাকমা সমাজ প্রবলভাবে এর বিরোধিতা করেছিল। বিরোধিতা সত্ত্বেও পরবর্তীকালে মি. মিলার *চাকমা প্রাইমার* নামে একটি শিশুপাঠ্য বই প্রকাশ করেছিলেন।

তবে স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালে সুগত চাকমা প্রথমবারের মতো *চাকমা বাঙলা কথাতারা* নামে একটি চাকমা-বাংলা অভিধান রচনা করেছেন। এটিই চাকমা ভাষার প্রথম অভিধান হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

২০০১ সালে 'জুম ইসথেটিকস কাউন্সিল' সংক্ষেপে জাক-এর সহায়তায় মোস্তাফা জব্বার চাকমা বর্ণমালার প্রথম সফটওয়্যার তৈরি করেন। সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের দ্বারা এ দেশের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলোর নৃ-ভাষাবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ উদ্যোগ যথাযথভাবে পরিচালিত হলে এ দেশের বিলুপ্তপ্রায় অনেক ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ভাষা ও বর্ণমালা সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবন দান করা সম্ভব হবে বলে অনেকে আশা প্রকাশ করছেন। কেননা, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মূল লক্ষ্যই হলো বিশ্বের সব ভাষার নমুনা সংরক্ষণ ও মৃতপ্রায় ভাষাকে পুনরুজ্জীবিত করা।

পুলক বরণ চাকমা

আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা (এমএলই) নিয়ে কর্মরত সকল সংস্থাকে *পহর* নিউজলেটারে প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত পরিসরে ছবিসহ এ কর্মসূচির পরিচিতি পাঠাতে অনুরোধ করা হল।

সেভ দ্য চিলড্রেন-এর এমএলই কার্যক্রম

বাংলাদেশে সেভ দ্য চিলড্রেন কার্যক্রম শুরু করে ১৯৭০ সালে। সেভ দ্য চিলড্রেন এমন এক পৃথিবীর স্বপ্ন দেখে, যেখানে প্রতিটি শিশুর বেঁচে থাকা, সুরক্ষা, বিকাশ এবং অংশগ্রহণের অধিকার অর্জন করবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সেভ দ্য চিলড্রেন ২০০৬ সালে 'শিশুর ক্ষমতায়ন' নামে এমএলই কার্যক্রম শুরু করে। মারমা, চাকমা ও ত্রিপুরা ভাষার শিশুদের নিয়ে খাগড়াছড়ি জেলার উপজেলা সদর, পানছড়ি উপজেলা ও দীঘিনালা উপজেলায় এই কার্যক্রমের সূচনা হয়। পরবর্তী সময়ে বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও কক্সবাজার এলাকায় বম, তঞ্চঙ্গ্যা, খেয়াং ও রাখাইন শিশুদের নিয়ে এই কার্যক্রম সম্প্রসারিত করে। জাবারাং কল্যাণ সমিতির সঙ্গে প্রথমে কর্মসূচির বাস্তবায়নের কাজ আরম্ভ হয়, পরে বলিপাড়া নারী কল্যাণ সমিতি, রাখাইন ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, তৈমু ও সাস-এর রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার ও বান্দরবানের কর্মসূচির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। এ পর্যন্ত ৭১১৮ জন শিশু মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষার জন্য প্রি-স্কুলে ভর্তি হয়েছে। ৭০৯১ জন শিশু প্রি-স্কুল শেষ করে সফলতার সঙ্গে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করছে।

সেভ দ্য চিলড্রেন সুনির্দিষ্ট একটি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে উপকরণ উন্নয়ন করে। উপকরণ উন্নয়নের জন্য প্রথমে কর্মশালার মাধ্যমে ভাষা এবং লিপি নির্বাচন করে। অতপর কমিউনিটির কাছ থেকে বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ করা হয়। পরে তা কর্মশালার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ভাষা কমিটির সদস্যদের নিয়ে শিশুদের উপযোগী বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ তৈরি করা হয়।

সেভ দ্য চিলড্রেন এর এমএলই উপকরণের একটি তালিকা এখানে দেওয়া হলো।

প্রাক-প্রাথমিক ১ : বড় বই, ছোট বই, মাতৃভাষায় বর্ণমালা চার্ট, ছবির কার্ড, শোনার গল্পের বই, মাতৃভাষায় সংখ্যার কার্ড, সংখ্যার কার্ড-বাংলায়, বাংলাভাষার বর্ণমালা চার্ট, গণিতের খেলার বই, বাইরের খেলার বই, ছড়ার ও গানের বই, মাতৃভাষা ছড়ার বই, আমি লিখি খাতা ও শিক্ষক নির্দেশিকা।

প্রাক-প্রাথমিক ২ : মাতৃভাষায় প্রাইমার, শোনার গল্প বই, মাতৃভাষায় সংখ্যার কার্ড, মাতৃভাষায় বর্ণমালা কার্ড, ছবির কার্ড, মাতৃভাষায় সংখ্যার কার্ড, সংখ্যার চার্ট-বাংলায়, সংখ্যার কার্ড- বাংলায়, মাতৃভাষায় বর্ণমালা চার্ট, মাতৃভাষায় গল্পের বই (পড়ার), ছবি আঁকার অনুশীলন বই, বাংলা ভাষায় গল্পের বই, মাতৃভাষা গণিত বই, পরিবেশ পরিচয় খেলার বই, বাইরে খেলার বই, আমি লিখি খাতা ও শিক্ষক নির্দেশিকা।

প্রথম শ্রেণি : মাতৃভাষার টেক্সট বুক, মাতৃভাষায় গণিত বই, বাংলাভাষায় বর্ণমালা বই, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বই, মাতৃভাষার গল্পের বই, বাংলা ভাষার গল্পের বই, মাতৃভাষায় পরিবেশ পরিচিতি চার্ট ও শিক্ষক নির্দেশিকা।

২য় শ্রেণি : মাতৃভাষার টেক্সট বুক, মাতৃভাষার গল্পের বই, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বই, বাংলা গল্পের বই, মাতৃভাষায় পরিবেশ পরিচিতি চার্ট ও শিক্ষক নির্দেশিকা।

৩য় শ্রেণি : মাতৃভাষার টেক্সট বুক, বাংলা গল্পের বই, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বই ও শিক্ষক নির্দেশিকা।

এমএলই কার্যক্রম পরিচালনাকারী অন্যান্য সহযোগী সংস্থা সেভ দ্য চিলড্রেন এর কাছ থেকে উপকরণ তৈরিতে সহযোগিতা নিয়ে থাকে ।

সেভ দ্য চিলড্রেন এর পক্ষ থেকে 'শিশুর ক্ষমতায়ন' প্রকল্পে এমএলই প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্মীদের প্রদত্ত প্রশিক্ষণ হলো : ১.এমএলই কার্যক্রম সম্পর্কিত পরিচিতিমূলক প্রশিক্ষণ ২. প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ ৩. শিক্ষকদের মৌলিক প্রশিক্ষণ ৪. ভাষা প্রশিক্ষণ ৫. রিফ্রেশার্স/ পুনঃ সতেজিকরণ প্রশিক্ষণ ৬. মাতৃভাষার উপর সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ ৭.অভিভাবকদের শিশু লালন-পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং ৮.উপকরণ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা।

শিশুর ক্ষমতায়ন প্রকল্পের সফল পরিচালনার মাধ্যমে সেভ দ্য চিলড্রেন স্বপ্ন দেখে একদিন বাংলাদেশের সকল শিশুর মতোই সকল আদিবাসী শিশুরা অন্তত প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষার অধিকার লাভ করবে এবং সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপের মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর সফল প্রয়োগ ঘটবে।

মেহেরুন্নাহার স্বপ্না

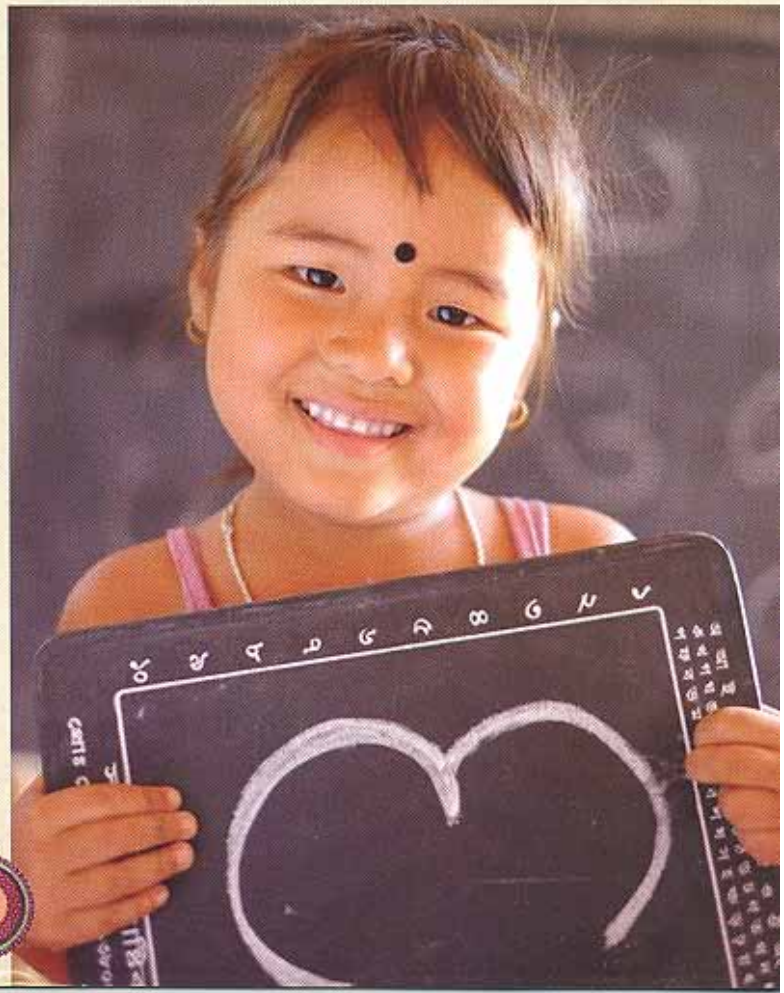

আম চুকলুক

হাজং ভাষা

বাখা দিনলী আগেলা কথা। এক হালুয়ালী মাগু ৩ মাসলা ছাওয়া থুইয়ী মুরিছে। পাশাপরশি মিল্লী হালীগে আবার বিয়ী কুরায়। হালুয়ী মাগুরী হাতুয়ী ছাওয়ারাগে গীল আদর দুই-দীও করে। ছাওয়ারাও হাতুয়ী মাওরাগে আপনা মাও নেখেন দেখে। হাতুয়ী মাওরালা কুনু ছাওআ ছুতা নীই। একদিনীলী জরতে হালী অয় মরে। তানি মায়-ছায় হুবীই মিল্লী কান্দে। ইংকীং দিন যায়, মাস যায় বছর ঘুরি। বুইশীখ জুষ্ঠি মাসলা তাপ কুমাবাগে বীর্ষালা মেঘ আহে। শরংলা পূজী বেদেন চীরফারে বাজনা বাজে। পাছনি হেমন্ত মুচক মুচকু কী আহিবীড়াই। জারকালিনি গাছ-থকন পাতা পড়ে। আবার বসন্তনি পাতা গুজায়, ফুল ফুটি পূখি গাহেন গাওয়ায়। হাতুয়ী মাওরা ছাওয়ারাগে বিয়ী কুরায়। সংসারনি আবার সুখলী বাতাস বহে।

হালুয়ী চাওয়া হালবায়-উলা মাগু পথবায় চাইয়ী থাকে। বুইশীখ যাইয়ী জুষ্ঠি আহে। গাছনি আম ফল হিলদীকে রাঙা হয়। হালুয়ী মাগু আম ফল দিয়ী অম্বল খাবাগে চায়। হাতুয়ী মাওরা অম্বল রীইন্দী দেয়। ভেন যায়, দুপূর গড়ায় হাল থকন হালুয়ী না আহে। হাতুয়ী মাওরা কয়, তয় ভাত খাইয়ী ফিলাও।

হালুয়ী মাগু ভাত না খাইয়ী অম্বলা চীখী চায়। অম্বলা তানকে মুজা হুছে বেদেন আবার একটিপা চায়। হাতুয়ী মাওরা আবার দেয়। আবার চায়-আবার দেয়। মনরা না ভরে বেদেন আবার চায়। হাতুয়ী মাওরা রাগ হুইয়ী কয় ইলা হাড়িলী বেকি খা। অম্বল হাড়িরী হাতনি নিয়ী বীউরীলী মাতানি ভাঙ্গে। হাড়িলী অম্বল সারা গাও মাখে। মুখনি লাল টক টক শুকনী মুরিচ-য়ী বীজিয়ী থাকে। হাড়িলী তলবায়লা কালি মাথানি মাখে। হাড়িলী রং দিয়ী মাথারা কালা হয়। অম্বল লা হিল্‌দী রং দিয়ী গাওরা হিল্‌দী হয়। ঠটনি মুরিচ বেদেন ঠটদা রাঙা হয়। চুকলুক চুকলুক কুরিয়ী আম চুকলুক পূখি হুইয়ী যায়। তানি পাখি রূপ নিয়ে উড়িয়ী যায়। হাতুয়ী মাওরা দিখী 'থ'কে রুলে।

হালুয়ী ছাওয়া দেখে দুপুর যাইয়ী বেলা যারা লাগিছে। তুরিঘুরিকে ঘরবায় যায়। কিন্তু আজিকী কাকবা পথ বায় চাইয়ী থাকিবাগে না দিখিলে। ঘর কানসি পালে-এগরা অ-চিনা পূখি চুকলুক চুকলুক কে ডাকায়। কুনু বিলা অয় ইমুন জাত পূখি নি দেখে। ঘরবায় যাইয়ী মাগুরাগে ডাকায়। পাছে হাতুয়ী মাওরালা থকন বেবাক কথা হুনিয়ী পূখিবায় লর দেয়। পূখিরী ই গাছ থকন উ গাছ যায়। হালুয়ী ছাওয়া পাছত পাছত যায়। হালুয়ী ছাওয়া ই-ঘি ঘর থকন বীড় হুলে আজি হুলে, কাককীও হুলে। বাখা দিনী পর জানিলে পাছগাওনি দুইদী অ-চিনী পূখি দেখা মিলিছে। পূখি জোড়া ডাকায় চুকলুক চুকলুক।

স্বপন হাজং

বাংলা ভাষা

অনেক দিন আগের কথা। এক কৃষকের স্ত্রী তিন মাসের সন্তান রেখে মারা যায়। প্রতিবেশীরা মিলে কৃষককে আবার বিয়ে করালো। কৃষকের স্ত্রী তার সৎ পুত্রকে আদর-শাসন দুই-ই করে। কৃষকের ছেলেটিও সৎ মাকে নিজের মায়ের মতোই মনে করে। সৎ মায়ের কোনো সন্তান নেই। একদিনের জ্বরে হঠাৎ কৃষক মারা গেল। মা ও ছেলে উভয়েই কাঁদে। এমনি করে দিন যায়, মাস যায়, বছর ঘুরে আসে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের তাপ কমাতে বর্ষায় বৃষ্টি নামে। শরতের পূজার জন্য চারদিকে বাজনা বাজে। পিছনে হেমন্ত মুচকি হাসে। শীতে গাছ থেকে পাতা ঝরে, আবার বসন্তে পাতা গজায়। ফুল ফোটে, পাখি গান গায়। সৎ মা ছেলেটিকে বিয়ে করায়। সংসারে আবার সুখের বাতাস বয়।

কৃষকের ছেলে হালচাষ করে। আর তার স্ত্রী পথের দিকে চেয়ে থাকে। বৈশাখ শেষে জ্যৈষ্ঠ আসে। আম গাছে আম হলদে রং ধারণ করে। কৃষকের ছেলের স্ত্রী আম দিয়ে অম্বল খেতে চায়। শাশুড়ি অম্বল রেঁধে দেয়। সকাল শেষে দুপুর গড়ায়। ক্ষেত থেকে কৃষকের ছেলে তখনও আসে না। শাশুড়ি বলে, তুমি খেয়ে নাও। কৃষকের ছেলের স্ত্রী ভাত না খেয়ে অম্বল চেখে দেখে।

অম্বল খুব মজা হয়েছে বলে কৃষকের ছেলের স্ত্রী আরেকটু চায়। শাশুড়ি আবার দেয়। সে আবার চায়, শাশুড়ি আবারও দেয়। মন ভরে না বলে সে আবার চায়। এবার শাশুড়ি রাগ করে বলে, এখন হাঁড়িশুদ্ধ খাও। এই বলে অম্বলের হাঁড়িটা হাতে নিয়ে বউয়ের মাথায় ভাঙে। হাঁড়ির অম্বলে বউয়ের সারা গা মেখে যায়। মুখে লাল টকটকে শুকনো মরিচ লেগে থাকে। হাঁড়ির তলার কালিটা মাথায় লেগে যায়। হাঁড়ির রঙে মাথাটা কালো হয়। অম্বলের হলুদ রঙে গা হলুদ হয়। ঠোঁটটি মরিচের জন্য লাল হয়। চুকলুক চুকলুক ডাক দিয়ে বউটি আম চুকলুক পাখি হয়। এরপর পাখির রূপ নিয়ে উড়ে যায়। শাশুড়ি তা দেখে থ বনে যায়।

কৃষকের ছেলে দেখে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চলেছে। সে তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে আসে। আজ কাউকে পথের দিকে চেয়ে থাকতে দেখা গেল না। ঘরের কাছে এলে একটি অচিন পাখি চুকলুক চুকলুক করে ডাকে। কোনো দিন সে এমন পাখি দেখেনি। ঘরে গিয়ে মাকে ডাকে। পরে সৎ মায়ের কাছ থেকে সমস্ত কথা শুনে পাখির দিকে দৌড়ে যায়। পাখি এক গাছ থেকে অন্য গাছে যায়। কৃষকের ছেলে তার পিছুপিছু যায়। কৃষকের ছেলে সেই যে ঘর থেকে বের হলো, আর ফিরল না। অনেক দিন পর জানা গেল পাঁচগাঁও পরে দুটি অচিন পাখির দেখা মিলেছে। পাখি জোড়া ডাকে চুকলুক চুকলুক।

অনুবাদক : হাজং হরিদাস রায়

এমএলই ফোরাম-এর ২৯তম সভা

গত ২৯ জুন ২০১৪ তারিখ বিকাল ৩:৩০ মিনিটে গণসাক্ষরতা অভিযান প্রশিক্ষণ কক্ষে 'এমএলই ফোরাম'-এর ২৯তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। এমএলই ফোরামের বিশেষ আমন্ত্রণে সম্মানিত অতিথি হিসেবে সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব রূপন কান্তি শীল। অধ্যাপক মেসবাহ কামাল, নির্বাহী প্রধান, আরডিসি/এনসিআইপি-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিনিধিসহ মোট ৩৩ জন উপস্থিত ছিলেন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এনসিটিবি কর্তৃক এমএলই কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা, এমএলই বিষয়ক আঞ্চলিক সেমিনার এবং এমএলই নিউজলেটার **পহর** প্রকাশনা বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এনসিটিবি কর্তৃক এমএলই কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা প্রসঙ্গে ড. সৌরভ সিকদার বলেন, এনসিটিবি'র এখনকার কাজ হলো কর্মশালা আয়োজন করে বই তৈরি করা। কিন্তু নানা কারণে এনসিটিবি এ কাজ শুরু করতে পারেনি বলে জানিয়েছে। জনাব এ. এইচ. এম. মহিউদ্দিন বলেন, ২০১৪-১৫ সালের Annual Operation Plan পাশ করার পর এনসিটিবি কাজ শুরু করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

সভাপতি মেসবাহ কামাল বলেন, 'আমাদের মনে হয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে কার্যক্রমের গতি তরান্বিত করা দরকার। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গঠিত এ সংক্রান্ত স্টিয়ারিং কমিটির সভাপতি এবং আজকের সভার সম্মানিত অতিথি এ ব্যাপারে আমাদের সহযোগিতা করতে পারেন।'

এ প্রসঙ্গে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব রূপন কান্তি শীল বলেন, আপনারা আমাদের কাছে এমএলই ফোরামের আলোচনা সভার বিষয় সিদ্ধান্ত ও সুপারিশসমূহ সব সময় পাঠিয়ে দেবেন। তাহলে এ বিষয়ে স্টিয়ারিং কমিটিতে আলোচনা হবে এবং কাজ শুরু করা সম্ভব হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সভায় সিলেট, ময়মনসিংহ ও পার্বত্য চট্টগ্রামে এমএলই বিষয়ক আঞ্চলিক সেমিনার এবং ঢাকায় এমএলই বিষয়ক জাতীয় সেমিনার আয়োজন করার প্রস্তাব রাখা হয়।

তনুজা শর্মা

নিউজলেটার পহর-এর চাহিদা নিরূপণ সভা

গত ২৯ জুন গণসাক্ষরতা অভিযান কার্যালয়ে পহর পত্রিকার চাহিদা নিরূপণ বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। গণসাক্ষরতা অভিযান এর উপ-পরিচালক তপন কুমার দাশের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সৌরভ সিকদার, এফআইভিডিবি'র সমন্বয়ক কুমার প্রীতীশ বল, বাংলাদেশ চাকমা ল্যাঙ্গুয়েজ কাউন্সিলের সদস্য শুভ্র জ্যোতি চাকমা, বাংলাদেশ আদিবাসী কবি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক প্রগতি খিসা, বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্টস কাউন্সিল (ঢাকা মহানগর) এর নেতা হ্লাংপ্রুসাই মারমা, চ্যানেল-৫ এর সিনিয়র প্রোডিউসার (নিউজ এন্ড প্রোগ্রাম) রায় ত্রিপুরা, বম ল্যাংগুয়েজ কমিটির চেয়ারম্যান লালজারলম বম, বাংলাদেশ চাকমা ভাষা পরিষদের সদস্য, চাকমা ভাষার পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে নির্বাচিত প্যানেল লেখক আনন্দ মোহন চাকমা, ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচির স্বপন চাকমা, প্রার্থনা কুমার ত্রিপুরা, সব্যসাচী সিন্‌হা, স্বপন এক্কা, সোহেল হাজং, যোগেন্দ্র নাথ সরেন, ইঞ্জিনিয়ার এসআই সফিক, চিত্র শিল্পী শিশির মল্লিক প্রমুখ।

সভায় **পহর** পত্রিকায় নিয়মিত বিষয়সমূহের পাশাপাশি আদিবাসী শিক্ষকদের অনুভূতি, আদিবাসী উদ্ধৃতি বাংলায় অনুবাদ করা, আদিবাসী বর্ণমালা, আদিবাসী বানানরীতি, আদিবাসী বিষয়ক প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের লেখা ও সাক্ষাৎকার, ইলাস্ট্রেশন-এ আদিবাসী নক্শা ব্যবহার করে Internal Illustration ব্যবহার করা, প্রতিটি Department-এর Different Illustration ব্যবহার করা , আদিবাসী শিশুদের আঁকা ছবি/নকশা ব্যবহার করে পৃষ্ঠা সজ্জা করা, বিশ্বব্যাপী পরিচিত আদিবাসী পুরাণ প্রকাশের প্রস্তাব করা হয়। এছাড়া আদিবাসী বিষয়ক সংবাদ প্রকাশ করার প্রস্তাব করা হয়। উপস্থিত অংশগ্রহণকারীগণ বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতায় সংবাদ প্রতিবেদক তৈরি, এ সকল প্রতিবেদকদের সংবাদ প্রণয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং আদিবাসী লেখক তৈরির জন্য অঞ্চলভিত্তিক কর্মশালা আয়োজন করার প্রস্তাব রাখা হয়।

খালেদা আক্তার লাবণী

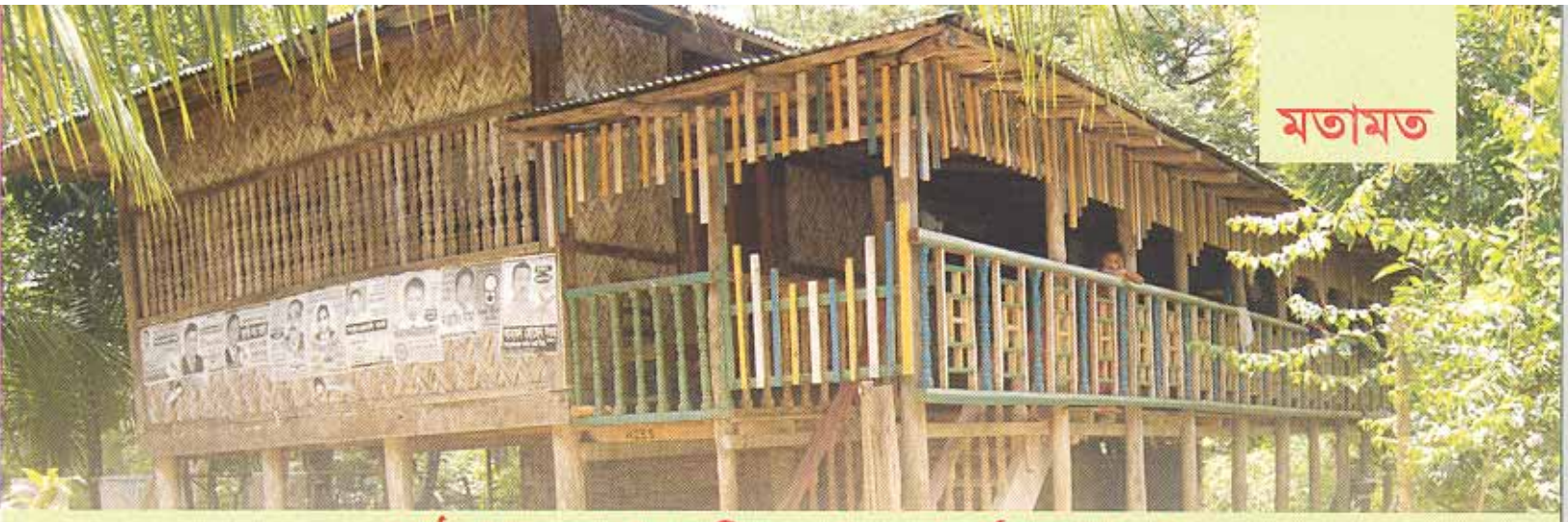

পাঠ্যপুস্তকে পাহাড়িদের সম্পর্কে তথ্য : ১

পাঠ্য পুস্তকে নিজেদের জাতীয় পরিচিতি সঠিকভাবে তুলে ধরার দাবি পাহাড়ি জনগোষ্ঠীগুলোর দীর্ঘদিনের। সাম্প্রতিক সময়ে বিশেষত বাংলা ও সমাজবিজ্ঞান বইয়ে কিছু কিছু সঠিক তথ্য উপস্থাপনের নজির দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এগুলোর পরিমাণ এতই কম ও ভুলে ভরা যে, যা আরো বৃদ্ধি করা এবং শুদ্ধ করার দাবি রাখে। কারণ ভুলে ভরা তথ্যগুলো দেশের কোমলমতি শিক্ষার্থীরা শিখে নিচ্ছে। এর ফলে তাদের মনে পাহাড়িদের সম্পর্কে হীন ও ভুল ধারণা জন্মাবে। এগুলো একটি জনগোষ্ঠীকে অপমান করার সামিলও বটে।

এই আলোচনায় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চলমান ৩য় শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যবই গুলোকে পর্যালোচনা করে কিছু অপ্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

তৃতীয় শ্রেণির *বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়* বইয়ে আমাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ক অধ্যায়ে পাহাড়িদের উৎসব বিষয়ে মাত্র একটি বাক্য রয়েছে। (পৃ-৬৫) অপরদিকে ভুলে ভরা তথ্যগুলো দেশের লক্ষ লক্ষ কোমলমতি শিশু শিখে নিচ্ছে।

৪র্থ শ্রেণির *বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়* বইয়ে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা শীর্ষক অধ্যায়ে মারমাদের সম্পর্কে যা লেখা হয়েছে তা রীতিমত আপত্তিকর। এতে উল্লেখ রয়েছে-ভাত আর সিদ্ধ সবজি মারমাদের প্রধান খাবার। তবে তাদের প্রিয় খাবার হচ্ছে 'নাপ্পি' বা শুটকি মাছের ভর্তা। অতীতে তারা বনজ সম্পদ থেকে ঔষধি গাছের মাধ্যমে চিকিৎসা নিত (পৃ-১৪)। মারমা জনগোষ্ঠী জুমচাষ, মাছ ধরা কাপড় ও চুরুট তৈরি করে এবং তা বিক্রি করে। সিদ্ধ সবজি কি কোনো জনগোষ্ঠীর প্রধান খাবার হতে পারে? নাপ্পি এবং শুটকি ভর্তা আলাদা দুটি জিনিস। নাপ্পি পাহাড়িরা সবজি তরকারিতে মসলার ন্যায় স্বাদবর্ধক হিসেবে ব্যবহার করে। কিন্তু প্রিয় খাবার না। আলোচ্য পাঠটি পড়লে শিক্ষার্থীরা মনে করবে-মারমারা এখনো লেখাপড়া শিখে না। এ জন্য তারা কাপড়, চুরুট বিক্রি করে জীবনযাপন করে। একটি জনগোষ্ঠীকে উপস্থাপন করার অনেক তথ্য থাকে। কিন্তু উপহাস করার সুযোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে এমন ধরনের তথ্য যা সত্য এবং বাস্তব হলেও তুলে ধরা অনুচিত, অন্তত সরকারি পাঠ্যপুস্তকে। আলোচ্য গ্রন্থে মারমাদের সাংগ্রাই উৎসবটির নাম লেখা হয়ে সাংগ্রাইন।

পঞ্চম শ্রেণির বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বইয়ের ধর্ম ও স্বদেশ প্রেম অধ্যায়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি ও উপজাতি (পাহাড়ি বা সরকারি ভাষায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী হতে পারত) বৌদ্ধরা অংশগ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্য যে সকল ব্যক্তির নাম আলোচ্য প্রবন্ধে উল্লেখ রয়েছে তার মধ্যে কোনো পাহাড়ি মুক্তিযোদ্ধার নাম উল্লেখ নেই। অথচ পাহাড়িদের মধ্যে ইউ কে চিং নামে একজন বীরবিক্রম উপাধিপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা রয়েছেন।

৭ম শ্রেণির *সপ্তবর্ণা* বইয়ে মারমাদের সম্পর্কে আরো লেখা হয়েছে, 'মারমারা ভাত, মাছ, শুটকি, পশু ও পাখির মাংস খায়। এছাড়াও বিভিন্ন কাঁচা তরি-তরকারিও খেয়ে থাকে।' (পৃ-৫৮) আধুনিক যুগে একটি জনগোষ্ঠীকে এভাবে তুলে ধরা অপমান ও হেয় করার সামিল। পঞ্চম শ্রেণির *বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়* বইয়ে ম্রো বিষয়ে লেখা হয়েছে বান্দরবান শহরের কাছে চিম্বুক পাহাড় গেলেই ম্রোদের দেখা যায়। চিম্বুক পাহাড়ে ম্রোদের দেখা মেলে! কী তাচ্ছিল্য? আজকাল ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাঙামাটি এমনকি বিদেশেও উচ্চ শিক্ষার্থে ম্রোরা পাড়ি জমাচ্ছে। ঐ লেখাতে আছে, পার্বত্য চট্টগ্রামের চিম্বুক পাহাড়ে গেলে ম্রোদের গ্রাম দেখা যায়। আবার লেখা হচ্ছে ম্রোদের প্রধান খাদ্য শুটকি, ভাত ও বিভিন্ন ধরনের মাংস। আলোচ্য অধ্যায়ে নৃত্যরত ত্রিপুরা নারীর যে ছবি দেওয়া হয়েছে সেটির পোশাক ত্রিপুরা নারীর নয়। এ নৃত্যটি করার সময় ত্রিপুরা নারীরা মাথায় রাখা বোতলে ফুল ব্যবহার করে না। ব্যবহার করে মোমবাতি। এটি ভুল নির্দেশক। দেশের কোমলমতি শিক্ষার্থী এ সকল ভুল তথ্য জানছে।

(চলবে)

শুভ্র জ্যোতি চাকমা

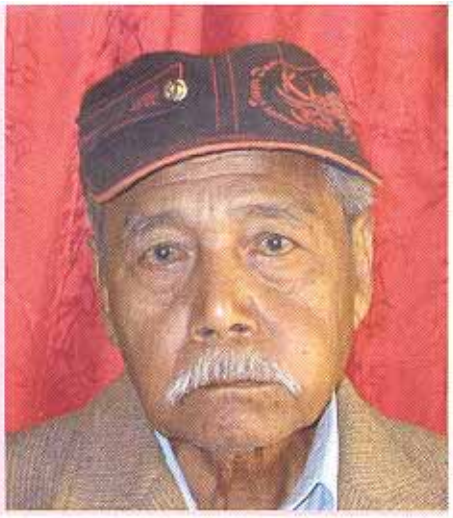

চলে গেলেন আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা ইউ কে চিং মারমা বীরবিক্রম

বান্দরবানের গর্বিত বীর মুক্তিযোদ্ধা ইউ কে চিং (উ ক্য চিং) বীরবিক্রম আর নেই। ২৫ জুলাই ভোরে চট্টগ্রামের একটি হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মুক্তিযোদ্ধা ইউ কে চিং মারমা বীরবিক্রম ১৯৩৭ সালে (মতান্তরে ১৯৩৩ সাল) বান্দরবান জেলার সদর থানার লাঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। মাতা হ্লিংসাউ আর পিতা বাউসাউ মারমা। বোমাং রাজা পরিচালিত স্কুলে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা সম্পন্ন করে ইউ কে চিং ১৯৫২ সালে ভর্তি হন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌সে (ইপিআর)। দীর্ঘ ৩০ বছরের বর্ণাঢ্য কর্মজীবন শেষে ১৯৮২ সালে অবসর নেন হাবিলদার মেজর হিসেবে। মুক্তিযোদ্ধা ইউ কে চিং মারমা একসময় ইপিআর এবং বিডিআর এর হকি খেলোয়াড় হিসেবে সবার কাছে পরিচিত ছিলেন। দীর্ঘদিন বিডিআর-এর হকি কোচ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

ইউ কে চিং বীরবিক্রম ১৯৭১ এর ২৫ মার্চ নায়েক হিসাবে রংপুর জেলার হাতিবান্ধা বিওপিতে কর্মরত ছিলেন। তিনি সেই বিওপিতে কর্মরত এক বিহারি কর্মকর্তা ও দুই পাকসেনাকে হত্যা করে ফাঁড়ির অবশিষ্ট বাঙালি ইপিআর সৈন্যদের নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ৬ নম্বর সেক্টরে যোগ দেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামে ইউ কে চিং প্রথম শত্রুর মুখোমুখি হন লালমনিরহাট জেলার তিস্তা নদীর খেয়াঘাটে। ২৪ জন বাঙালি সৈনিককে সঙ্গে নিয়ে পূর্ব সিদ্ধান্তক্রমে শত্রুর ঘাঁটি চিহ্নিত করে ডিফেন্স নেন। ৩ দিন বাংকারে অবস্থান নেওয়ার পর পাকসেনারা চতুর্থ দিন রাতে ফায়ার শুরু করে। রাতভর ভারী অস্ত্র দিয়ে ফায়ার করলেও মুক্তিযোদ্ধারা ফায়ারের জবাব দেয়নি। ফায়ার চলাকালীন অবস্থায় ইউ কে চিং একটি স্টেনগান ও ৯টি গ্রেনেডসহ দুই সৈনিককে নিয়ে বাংকারগুলো পরিদর্শন করতে যান। ওখানে তিনি দেখেন, কোনো বাংকারে কোনো বাঙালি সৈনিক নেই। তারা সবাই পালিয়ে গেছে। তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। এ অবস্থায় ফায়ারের মধ্যে তিনি একটি বাংকারে আশ্রয় নিয়ে রাত কাটান। পরদিন ভোর ৪টার দিকে পাকসেনারা ফায়ার বন্ধ করে। পাকসেনারা ফায়ার বন্ধের কিছু সময় পর ইউ কে চিং বাংকার থেকে উঠে লক্ষ্যহীন ভাবে চারিদিকে এসএমজি রাইফেল দিয়ে ফায়ার করতে থাকেন। দেখলেন বাংকারের পাশে কোনো শত্রুর উপস্থিতি নেই। এ অবস্থায় ইউ কে চিং দুই সিপাহীসহ প্লাটুন হেডকোয়ার্টারে আসেন। এ খবরটি মিত্রবাহিনীর এক মেজর জেনে ইউ কে চিংসহ ঐ ২৪ জন বাঙালি সৈনিককে ভারতের একটি ক্যাম্পে ডাকলেন। তিনি তাদের বললেন, এভাবে যুদ্ধ করলে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে না। তিনি সৈনিকদের সাহস যোগান। ইউ কে চিং-এর বীরত্বের প্রশংসা করেন।

ইউ কে চিং দল নিয়ে ফিরে এসে বাঘাবান্দা বিওপির দখল নিতে ভারতের ভূখণ্ডে রাতে বাংকার তৈরির কাজ শুরু করেন। পাকসেনা মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতি টের পেয়ে সন্ধ্যায় বাংকার লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে থাকে।

পরদিন ভুরুঙ্গামারি বাজারের কাছে ডিফেন্স নেন ইউ কে চিং এর নেতৃত্বাধীন মুক্তিযোদ্ধারা। এ স্থানটি ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। রাতে তারা বাংকারে অবস্থান নেন। এসময় সম্মুখযুদ্ধে তিনি সুলতান নামের এক সৈনিককে হারান। শত্রুর অবস্থানে খবর দিত এমন এক কিশোরকে ধরে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে পাকসেনারা। কিন্তু বাঙালি সৈন্যরা এ অবস্থায় বাংকার ছেড়ে পালায়নি। পরদিন মিত্রবাহিনীর এক মেজরের নেতৃত্বে ইউ কে চিং বীর বেশে যুদ্ধ করেন। সারারাত যুদ্ধ চলে। সকালে দেখেন পাকিস্তানিরা ভুরুঙ্গামারি ছেড়ে পালিয়ে গেছে। এ যুদ্ধের পর মিত্র বাহিনীর প্রধান অরোরা ভুরুঙ্গামারি আসেন। তিনি রণকৌশল, বাংকার নির্মাণ ও শত্রুর জন্য তৈরি করা ফাঁদসহ সার্বিক বিষয় দেখে ইউ কে চিং-এর প্রশংসা করেন।

ইউ কে চিং বাংলা, উর্দু এবং হিন্দিতে কথা বলতে পারতেন। দেশকে শত্রুমুক্ত করার কাজে ইউ কে চিং স্বাধীনতা সংগ্রামে ৯ মাস ব্যস্ত ছিলেন। রংপুর, লালমনিরহাট, পাখিউড়া, কাউয়াহাগা, বাঘবান্ধা, হাতিবান্ধা, চৌধুরীহাট, ভুরুঙ্গামারী, কুলাঘাট প্রভৃতি অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন। ইউ কে চিং কেবল যুদ্ধ করেননি, নিরীহ বাঙালিদের পৌঁছে দিয়েছেন ভারতের শরণার্থী শিবিরে।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ইউ কে চিং আজ আর নেই। আমরা তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

কুমার প্রীতীশ বল
তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট

গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক এমএলই নিউজলেটার **পহর** প্রকাশিত হল। এই পত্রিকার মান উন্নয়নের জন্য মতামত প্রদান করতে সকলের প্রতি আহবান জানানো হচ্ছে। এ বিষয়ে যে কোনো ধরনের মতামত 'গণসাক্ষরতা অভিযান' - এর ঠিকানায় পাঠানোর অনুরোধ রইল।

European Union

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ)-এর সহায়তায় **গণসাক্ষরতা অভিযান**
৫/১৪ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা - ১২০৭ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৫৮১৫৩৪১৭, ৯১৩০৪২৭, ৮১৫৫০৩১-২, ফ্যাক্স : ৯১২৩৮৪২
ই-মেইল : info@campebd.org; ওয়েব : www.camebd.org